আহমদ শরীফের বঙ্কিম-বীক্ষা

সৈয়দ আজিজুল হক*

সত্য উচ্চারণে নির্ভীকতাই আহমদ শরীফের (১৯২১-১৯৯৯) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর মুক্তবুদ্ধি, জীবনদৃষ্টির স্বচ্ছতা, সমাজবিশ্লেষণে নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি তাঁর রচনাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও তার সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার অধিকাংশ কাল জুড়েই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনি একাগ্র ধ্যানে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই অখণ্ড মনোযোগের ফলেই তাঁর বিশ্লেষণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিচিত্র মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে এ কারণেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এ ছাড়া তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে দেশভাবনা, জাতিচিন্তা, সংস্কৃতিচেতনা, দর্শন ও ইতিহাসবোধ এবং আধুনিককালের সাহিত্য মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের অংশীভূত হয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ। তবে স্বীকার্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিবেচনায় তাঁর সাফল্য যতটা চূড়াস্পর্শী, আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিচারে ততটা সন্দেহাতীত বা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। আধুনিক সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও তিনি নিজের বক্তব্যই পরবর্তীকালে খণ্ডন করেছেন, কখনও কখনও একেবারেই বিপরীত মত পোষণ করেছেন, কখনও কখনও তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। তবে এই পারম্পর্যহীনতার মধ্যেও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হলো, নিজ মত প্রকাশে তাঁর সততা ও স্বতঃস্ফূর্ততা।

বঙ্কিম-মূল্যায়নে ব্রতী হয়ে লেখক দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এর প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম : 'বঙ্কিম মানস' (১৯৬০); এটি লেখকের প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮)য় সংকলিত। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম : 'বঙ্কিম-বীক্ষা : অন্য নিরিখে' (১৯৭৫); এটি সংকলিত হয় লেখকের *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (১৯৭৯) শীর্ষক গ্রন্থে। দুটি প্রবন্ধের রচনাকালগত ব্যবধান দেড় দশক। প্রথমটি যখন রচিত হয় তখন আমরা পাকিস্তান নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অধীন, আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটির রচনাকালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তার অন্যতম আদর্শ।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম প্রবন্ধ 'বঙ্কিম মানস'-এ লেখক বঙ্কিমের শিল্পীসত্তার বিশ্লেষণে কেবল নেতিবাচক উপাদানই প্রত্যক্ষ করেছেন। বঙ্কিমের মনীষা, প্রতিভা প্রভৃতি সম্পর্কে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। হিন্দুত্ববাদ এবং মুসলিম-বিদ্বেষই বঙ্কিম মানসের প্রধান প্রবণতা—প্রথম প্রবন্ধে এটিই লেখকের সিদ্ধান্ত। অথচ আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে হিন্দুত্ববাদের জাগরণ ঘটেছিল তাঁর লেখকজীবনের শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক একথা স্বীকার করেছেন এবং বঙ্কিমের যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, উদার মানবভাবনা এবং স্বাজাত্যবোধ সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। শেষ জীবনে বঙ্কিমের মতো প্রতিভা সামগ্রিক মানবকল্যাণচিন্তা থেকে সরে গিয়ে হিন্দুহিতৈষণায় মনোনিবেশ করায় লেখক দুঃখ পেয়েছেন। দুটি প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পাশাপাশি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে লেখকের প্রথম ও দ্বিতীয় মতের মধ্যে ব্যবধান কত দুস্তর।

প্রথম প্রবন্ধ

ক. বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন য়ুরোপীয় জীবন-মহিমায় মুগ্ধ। কিন্তু তিনি সম্বিৎ হারান নি। তাই তিনি জীবনের সাধনা ও আবাহন করেছেন জীবনব্যাপী নিজের জন্য নয়—বাঙালী হিন্দুর জন্যে।... তাই তিনি খিড়কী পথেই য়ুরোপের অবদান অঞ্জলিভরে গ্রহণ করলেন।... তাই শাড়ি-সিঁদূর পরা মেমসাহেবই তাঁর আদর্শ নারী। তেমনি মর্যাদায়, সাহসে ও পৌরুষে দৃপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানই তাঁর আদর্শ পুরুষ।... (*বিচিত চিন্তা*, পৃ. ৩১১)

খ. বঙ্কিমচন্দ্র যা কিছু লিখেছেন তা কেবল হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর উন্নতির জন্যেই।... (ঐ, পৃ. ৩১২)

গ. বঙ্কিম স্বজাতিকে বড় ভালবাসতেন। তাঁর চিন্তা, ধ্যানধারণা সবই একান্তভাবে হিন্দুর জন্যে।... (ঐ, ৩১৫)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ক. স্বদেশের ও স্বজাতির প্রেমিক ও সেবক বঙ্কিম প্রতীচ্য আদলে জাতিগঠনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও সাগ্রহে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের লেখনী তাই স্বজাতির চিত্তবোধন, হিতসাধন, লক্ষ্যচিন্তন ও গৌরবকথন কর্মে উৎসর্গিত হয়েছিল।... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা*, পৃ. ১৭৪)

খ. বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলত জগৎ ও জীবনরসিক এবং সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক।... (ঐ, পৃ. ১৭৪)

গ. হিতবাদ অঙ্গীকারে মানবকল্যাণ লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধি বঙ্কিম মানব-জীবনের রহস্য-আবিষ্কারের প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।... (ঐ, পৃ. ১৭৬)

ঘ. কোঁতের মতো বঙ্কিমও সমাজের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করতেন এবং মানুষের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা।... (ঐ, পৃ. ১৮০)

পাশাপাশি উদ্ধৃত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, বঙ্কিমের 'চিন্তা, ধ্যান-ধারণা সবই একান্তভাবে হিন্দুর জন্যে'— এমন মনোভাব থেকে লেখক পরবর্তীকালে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। এবং বঙ্কিমের শিল্পবোধে মানবকল্যাণ-চিন্তাই যে মুখ্য স্থান দখল করেছিল তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী জীবনরসিক বঙ্কিম যে মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ থেকেই মানবকল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছিলেন, দ্বিতীয় প্রবন্ধেই লেখক তা গভীরভাবে অনুধাবন করেন। লক্ষণীয় বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লেখকের অভিমত :

প্রথম প্রবন্ধ

...বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় প্রত্যয়দৃঢ়তা ও উদারবিস্তার নেই; অসামঞ্জস্য আছে অনেক।... (*বিচিত চিন্তা,* পৃ. ৩১২)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

...স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, দিগন্তবিসারী দৃষ্টি ছিল তাঁর। সে-দৃষ্টিতে জগতের ও জীবনের অন্ধি-সন্ধি সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ কররার দুর্লভ সামর্থ্যও ছিল তাঁর।... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৬৪)

এ ক্ষেত্রেও লেখক প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতার অভাব লক্ষ করেন, অথচ দ্বিতীয় প্রবন্ধেই তাঁর এমন দিগন্তবিসারী দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেন যে-দৃষ্টিবলে বঙ্কিম জীবন ও জগতকে সামগ্রিকভাবে তার আত্মাসমেত পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের এক দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী। বঙ্কিমের মনীষা সম্পর্কে লেখকের অভিমত স্মরণীয় :

প্রথম প্রবন্ধ

...তাঁর মানস গড়ে উঠেছিল বই পড়ে আর গাঁয়ের পুরোনো ধরনের পরিবেশে। কাজেই কলকাতা শহরের মুক্তবুদ্ধি শিক্ষিত তরুণের মনের স্পর্শ তিনি পাননি।... (*বিচিত চিন্তা,* পৃ. ৩১৩)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

য়ুরোপীয় বিদ্যার, ঐশ্বর্যের ও সংস্কৃতির চোখধাঁধানো-মনভোলানো প্রথম অভিঘাতে ভাঙার পালা শেষে দ্বিতীয় স্তরের বা প্রজন্মের প্রতীচ্যবিদ্যাপ্রাপ্ত ঐ স্থিতধী গঠনকামীদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতীচ্যবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনকালে মিল-বেন্থাম-কোঁতের হিতবাদ-মানববাদের প্রভাবে অভিভূত ছিলেন। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ও সহানুভূতির ভিত্তিতেই তাঁর মানসকুসুমের বিকাশ। মানুষের কল্যাণবাঞ্ছাই ছিল তাঁর সব ভাব-চিন্তা-কর্মের উৎস। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ ও উদার ধারণা নিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু।... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৬৪)

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষীদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত কিংবা শেষ জীবনে হিন্দুত্ববাদের প্রচার কিংবা মুসলিম–বিদ্বেষ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও একথা অনস্বীকার্য যে সমকালীন ভারত ও ইওরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি

গভীরভাবে তাঁর মনীষাকে যুক্ত করেছিলেন এবং তা দ্বারা নিজের চিন্তাজগৎকে আলোকিত রেখেছিলেন। সমকালীন ইওরোপের প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী জন স্টুয়ার্ট মিল-এর উপযোগিতাবাদ তত্ত্ব দ্বারা আলোড়িত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সঙ্গে সাম্যবাদী চিন্তাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মানবকল্যাণ ভাবনার সঙ্গে এসব তত্ত্বের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। বঙ্কিমের প্রতিভা মূল্যায়নে লেখকের আরও কিছু বক্তব্য এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য :

প্রথম প্রবন্ধ

ক. ...তাঁকে আমরা যুগন্ধর ও যুগোত্তর প্রতিভা বলে জানতাম। এতকাল পরে যখন তাঁর সম্বন্ধে আচ্ছন্নভাব কেটে গেছে, তখন দেখতে পাচ্ছি—তাঁর অপূর্ণতা এবং প্রতিভাসুলভ মৌলিকগুণের অভাব।... (*বিচিত চিন্তা,* পৃ. ৩১৪)

খ. বঙ্কিম যুগসৃষ্টি, যুগধর ও যুগ-প্রতিভূ।... (ঐ, পৃ. ৩১২)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অসামান্য। জ্ঞান-পিপাসাও ছিল অসাধারণ। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যে, দর্শনে ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীতরূপে গভীর ও ব্যাপক। ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর কৌতূহল। বঙ্কিম-রচনায় বঙ্কিমকে আমরা সর্ববিদ্যাবিশারদরূপেই পাই।... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৮১)

লেখকের শেষোক্ত বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট যে, বঙ্কিমের প্রতিভার দীপ্তি অনুধাবনে তিনি প্রথম প্রবন্ধে কতটা ক্ষীণদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধেই লেখক বঙ্কিমের সৃষ্টিশীল প্রতিভার অসাধারণত্ব এবং তাঁর জ্ঞানজিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নে সক্ষম হন। অতঃপর বঙ্কিমের ধর্মবোধে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে লেখকের অভিমত উদ্ধারযোগ্য :

প্রথম প্রবন্ধ

...শেষ বয়সে যখন তিনি আগের মতো স্থিতধী রইলেন না তখন আন্তরিক উত্তেজনায় য়ুরোপের সাহিত্য-দর্শন ও সভ্যতার প্রতিই যে কেবল অবজ্ঞা দেখালেন, তা নয়, হিন্দুয়ানীর মহিমা প্রচার না করে উপন্যাস লিখে সময় নষ্ট করেছেন বলে আফসোসও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের এই উগ্রতা ও একগুঁয়েমি তাঁর স্থায়ী কলঙ্ক। (*বিচিত চিন্তা,* পৃ. ৩১২)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

...যৌবনে যিনি নাস্তিক পুরুষসিংহ, সেই অমিতমনীষা ভগ্নস্বাস্থ্য প্রৌঢ় বঙ্কিম ভীরু-হৃদয় সাধারণের মতো ধর্মভাবের দুর্গে আশ্রিত হয়েছিলেন, ভাবতে দুঃখ হয়— আফসোস বাড়ে। (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৮২)

প্রথম প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমকে যেখানে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুবাদ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন সেখানে দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমের শিল্পীমানস-বিশ্লেষণে অনেক বেশি বাস্তবানুগ, অনেক বেশি সত্যের নিকটবর্তী। বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনালগ্নে ছিলেন পরিপূর্ণরূপে মানববাদী, মুক্তদৃষ্টির অধিকারী। ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনা এবং সমকালীন সমাজজীবনের নানা টানাপোড়েন ও সংকটের অভিঘাতে সেই সাম্যবাদী মানবহিতৈষী বঙ্কিমের মধ্যেই জাগ্রত হয় এক ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা, একান্তভাবে নিজ ধর্মের প্রতি অতিমাত্রার আসক্তি। এর পরিণতিতে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ দুধরনের লেখাই হয়ে ওঠে অনেকাংশে পক্ষপাতদুষ্ট। সাহিত্যজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বঙ্কিমমানসের এই পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমের এই পরিবর্তনকে তাঁর ব্যক্তিজীবন, চাকরিজীবন, সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. বঙ্কিম চল্লিশোত্তর জীবনে খাঁটি হিন্দু হবার সাধনায় দেহ-মন-আত্মা নিয়োজিত করলেন। ... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা*, পৃ. ১৭৮)

২. পঁয়তাল্লিশোত্তর জীবনে বঙ্কিম একেবারে অন্য মানুষ। সে-মানুষ 'সাম্য' রচনার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত এবং পুনর্মুদ্রণে নারাজ। (ঐ, পৃ. ১৭৯)

৩. বঙ্কিমচন্দ্র মানবকল্যাণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন, শেষাবধি সে-মানুষ কেবল হিন্দু হয়ে উঠল।... (ঐ, পৃ. ১৮০)

৪. সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু 'মানুষ' হিসাবে, এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি ' হিন্দু' হিসেবে।

অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য হচ্ছে মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত ও আলেখ্য।... (ঐ, পৃ. ১৮১)

'বঙ্কিম মানস' প্রবন্ধটিতে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিম-বিদ্বেষী হিসেবে তাঁর 'পক্ষপাতদুষ্টতা'কে তুলে ধরেছেন। কিন্তু শেষ বয়সে বঙ্কিম যখন হিন্দুত্বের মহিমা প্রচারে ব্রতী তখনও যে তিনি হিন্দু-মুসলিম চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিক হিসেবে সততার পরিচয় দিয়েছেন সে-বিষয়টি লেখকের প্রথম প্রবন্ধে পুরোপুরিভাবেই অনুল্লেখিত। বঙ্কিমের মুসলিম-বিদ্বেষ প্রতিপন্ন করার জন্য ওই প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিম-বিদ্বেষে নিজেই যেন পক্ষপাতদোষের শিকার। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিম-মূল্যায়নে লেখকের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় :

১. ..বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত ক্ষোভ ও নিন্দা বাস্তবেও মিথ্যে ছিল না। তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতিত্ব-গর্বী দেশী মুসলমান অকারণে এ-নিন্দা গালি নিজেদের গায়ে মাখে। 'মুসলমান'-এর স্থলে 'মুঘল' লিখলে হয়তো তাদের গায়ে এতোটা লাগত না। (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা*, পৃ. ১৭৩)

২. [সীতারাম ও রাজসিংহ প্রসঙ্গে] ... গোড়ায় গোঁয়ার মুসলমান ও শেষের দিকের চাঁদশা ফকির চরিত্রে দোষ-গুণের সমতা রক্ষিত হয়েছে। চঞ্চলকুমারীর আওরঙ্গজেবের তসবিরে পদাঘাত আর মুসলিম গোঁয়ারের রাস্তা প্রতিরোধ মানুষের একই নীচ প্রবৃত্তির প্রকাশ। লক্ষণীয় চঞ্চলকুমারী আকবর-জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা, কাজেই এ জাতি-বিদ্বেষ নয়, স্বকালীন শাসক বিদ্বেষ। (ঐ, পৃ. ১৭৩)

৩. আশ্চর্য, রাজনৈতিক কারণে এতকাল অস্বীকৃত হলেও মানতেই হবে যে বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র মাত্রই (আমাদের মতে বিতর্কিত জেবউন্নিসাও) সাধারণভাবে অনিন্দ্য নয় শুধু, এদের কেউ কেউ উঁচু মানের ও অনন্য মানুষ। আয়েষা, ওসমান, কৎলু খাঁ, মেহেরুন্নিসা, সেলিম, মহম্মদ আলী, মীরকাসিম, দলনী, মবারক, দরিয়া, আওরঙ্গজেব, জেবউন্নিসা, চাঁদশা—এদের মধ্যে আয়েষা, ওসমান, মহম্মদ আলী, মবারক, দরিয়া অনন্য। (ঐ, পৃ. ১৭৫)

এভাবে অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায়। প্রথম প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিম-বিশ্লেষণে একপেশে দৃষ্টি ও অস্বচ্ছতার পরিচয় দিলেও দেখা যায়, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনিই হয়ে উঠেছেন সামগ্রিকতাস্পন্দী ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী। বঙ্কিমের উপন্যাস-বিশ্লেষণেও লেখকের এই দ্বিবিধ মনোভঙ্গির পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, প্রথম প্রবন্ধে লেখক *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাস-প্রসঙ্গে বলেছেন :

...এমন যে রোম্যান্টিক রচনা কপালকুণ্ডলা, তাতেও মতিবিবির মাধ্যমে হিন্দুয়ানীকেই (হিন্দু সতীর পতিপ্রাণতাকে) মহিমান্বিত করেছেন।... (*বিচিত চিন্তা,* পৃ. ৩১২)

অথচ দ্বিতীয় প্রবন্ধে লক্ষ করা যাবে, লেখক মতিবিবির চরিত্র-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে পূর্ব-ধারণাপ্রসূত কোনো মন্তব্য না-করে বরং সাহিত্যরসের অনুগামী হয়েছেন। লেখক মতিবিবির জীবনসমস্যাকে যথার্থ অর্থে একটি নারীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটের গভীরতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। লেখকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

...কপালকুণ্ডলা একটি ট্রাজেডী— এবং সে ট্রাজেডী মতিবিবির জীবনেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।— এখানেও সবাইকে এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে, লেখকের অজ্ঞাতেই, মতিবিবিই প্রধান। ভোগলিপ্সু বলে তাকে তাচ্ছিল্য বা নিন্দিত করা চলে না। কেননা, সম্ভোগপিপাসা চরিতার্থ করবার তার অন্য উপায়ও ছিল।... (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৬৬)

রাজসিংহ উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, হিন্দুর বাহুবল দেখাবার জন্য *রাজসিংহ* রচিত হলেও সেখানে মবারক-জেবউন্নিসা-দরিয়া এবং ঔরঙ্গজেব-নির্মলকুমারীর কাহিনীই প্রাধান্য অর্জন করে। লেখকের ভাষায় : "... গ্রন্থপাঠে মনে হয় রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী উপলক্ষ মাত্র। মবারক-জেবুন্নিসা-দরিয়ার জীবন-সমস্যাই মুখ্য চিত্র।... হিন্দু-মহিমার উদ্গাতা বঙ্কিম কাহিনীর মধ্যে আত্মবিস্মৃত, সংকল্পবিচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানব মনোবৃত্তির গতিপ্রকৃতিজিজ্ঞাসু শিল্পী বঙ্কিমে পরিণত হন। তখন লীলাচঞ্চল জীবন তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত রাখে।" (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৬৭)।

লেখকের মতে, কেবল "আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে মুসলিমের প্রতি নিন্দা, বিদ্রূপ এবং অশালীন কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে। মুসলমান-বিদ্বেষবশে করলে দুর্গেশনন্দিনী-মৃণালিনী-চন্দ্রশেখর-সীতারামেও তা' থাকত। এর কারণ আরও গভীরে।" (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৭১)। এই গভীর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, মুর্শিদকুলি খানের শাসনের পরে বাংলায় নানা কারণে মানুষের জীবন-জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার অভাব ছিল প্রকট। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতা, বর্গীদের বারবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন, নবাবদের অযোগ্যতা, সামন্ত প্রভুদের নির্যাতনবৃদ্ধি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইওরোপীয় বণিকদের প্রাবল্য প্রভৃতির ফলে জনজীবনে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা তীব্ররূপ লাভ করেছিল। এজন্য মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছিল রাজশক্তির ওপর। আঠারো শতকের সমাজজীবনকে পটভূমি হিসেবে নিয়ে রচিত উক্ত দুই উপন্যাসে এ-কারণে, লেখকের মতে, মুসলিম (শাসক হিসেবে) নিন্দা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এভাবে দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমের উপন্যাসে মুসলিমদের প্রতি কটূক্তির একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দাঁড় করান এবং বঙ্কিমকে মুসলিম-বিদ্বেষের দায় থেকে অনেকাংশে মুক্তি দান করেন। শেষজীবনে বঙ্কিমের ধর্মাসক্তি সম্পর্কে লেখকের ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন : "ঊনিশ শতকে বঙ্কিমই যে কেবল এ ভ্রান্তির শিকার ছিলেন তা নয়, বিদ্যাসাগর ব্যতীত সবাই— রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-শ্রদ্ধানন্দ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, সৈয়দ আহমদ খান, জামালউদ্দিন আফগানী, হালী-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ, কেরামত আলী, ইকবাল প্রভৃতি শাস্ত্রেই খুঁজেছেন নবজীবনের আবেহায়াত।" (*প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* পৃ. ১৬৪)

বঙ্কিম-বিশ্লেষণে আহমদ শরীফের এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। লেখকের পাণ্ডিত্য ও মুক্তদৃষ্টির গভীরতাও এক্ষেত্রে সহজেই অনুধাবন করা যায়। ১৯৬০ সালে রচিত প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক বঙ্কিম-মূল্যায়নে যে খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা দেড় দশকের ব্যবধানে রচিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে গেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করার ফলে বঙ্কিমের সৃষ্টিশীলতা ও জীবনজিজ্ঞাসার স্বরূপ যথার্থভাবে উন্মোচিত হয়েছে। দুটি প্রবন্ধে লেখকের এই যে উত্তরণ-প্রয়াস তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য এবং ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করতে পারার যে ক্ষমতা এক্ষেত্রে পরিস্ফুটিত তা একজন লেখকের দুর্লভ শক্তি ও সামর্থ্যেরই পরিচয়বাহী।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা,* চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৭৫ (প্র. প্র. ১৯৬৮)

আহমদ শরীফ, *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* অক্ষর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ (প্র. প্র. মে ১৯৭৯)